Volume VII, Issue 13
August 2021

ISSN : 2454-3322

SHINJAN

Multi-Disciplinary, Bi-Annual, Multi-Lingual and Peer-Reviewed Journal

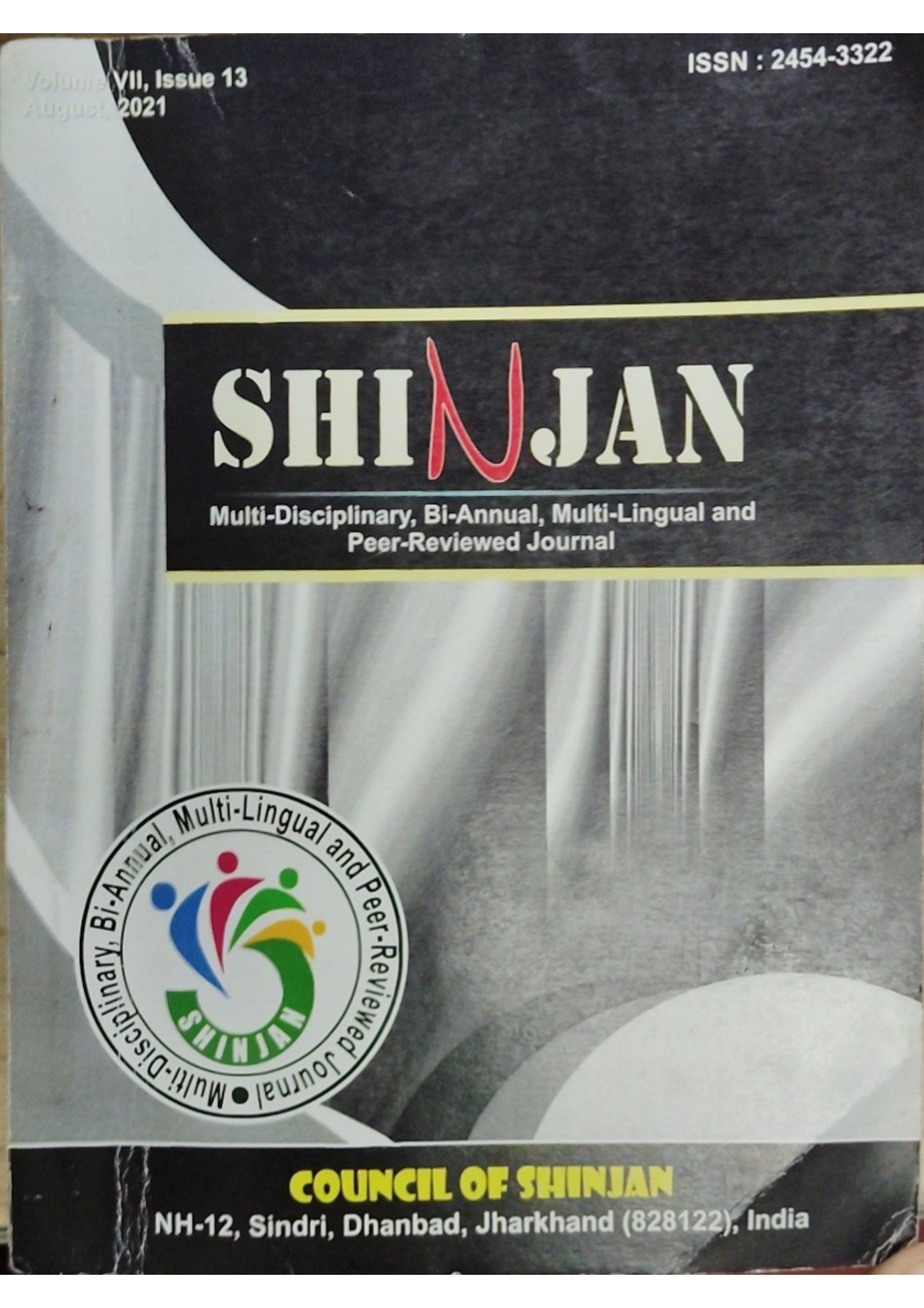

COUNCIL OF SHINJAN
NH-12, Sindri, Dhanbad, Jharkhand (828122), India

SHINJAN

Multi-Disciplinary, Bi-Annual, Multi-Lingual and Peer-Reviewed Journal

AUTHOR'S COPY

Volume-VII, Issue-13, August-2021

COUNCIL OF SHINJAN

North Hostel-12, Sindri, Dhanbad, Jharkhand (828122), India

SHINJAN

Multi-Disciplinary, Bi-Annual, Multi-Lingual and
Peer-Reviewed Journal

Volume-VII, Issue-13, August-2021

© Editor-in-Chief

E-mail : shinjanjournal2014@gmail.com
Website: www.shinjan.in

Editor-in-Chief
Dr. Sarmistha Acharyya

Executive Editor
Mr. Afaz Uddin Mandal, Assistant Teacher
Ranagarh High School (H.S.), Ranagarh, Pandua, Hooghly, West Bengal

GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS
(Strictly follow the Guidelines)

1. SHINJAN is a bi-annual, multi-lingual, multi-disciplinary, peer-reviewed, International journal, invited articles from Educationist, Academicians, Research Scholar, Student, Social Worker and Journalist.
2. Maximum length of the full paper should be of 3000 to 4000 words in A4 size paper.
3. Article must be sent through e-mail only with PDF and non PDF format (for English articles use MS-Word, Font- Times New Roman, Size-12pts.,Line Spacing -1.5, Margin- 1inch all sides and for Bengali articles use only Avra Indesign and for Hindi Articles use only Yougesh/ Kruti Dev 0010 or Kruti Dev 0020 font)
4. Each article should contain the following essential elements: Abstract, Key words, Discussions and References alphabetically arranged in APA format (6th Edition). Graphs, if any, should be sent in editable format (non PDF).
5. The article must accompany declaration signed by authors' that the article has not be published anywhere. Without self-declaration no paper will be accepted.
6. Opinions expressed in the articles extremely subject to the contributors. Council of Shinjan does not responsible for any kind of personal opinion of contributors.
7. Editorial Board and Subject Experts of the SHINJAN Journal may edit the paper if necessary.
8. In main article don't mention the author's name. You can only mention the name of article, abstract, main essay, references. Personal details will sent in another sheet including paper title, own email ID, mobile number and full postal address with pin code.
9. Paper or article can be withdrawn within seven days from the date of submission.
10. Deadline for submission the article for February Issue is 31January and for August Issue is 31 July in every year.

Binding by
Akkhay Binding, Station Road, Ghoshpara, Kalyani, Nadia, West Bengal- 741235.
Printed by
Desktop Computer Zone, B-4/466, Kalyani, Nadia, West Bengal- 741235.
Published by
Dr. Sarmistha Acharyya
North Hostel-12, Post- Sindri, Dist- Dhanbad,
State- Jharkhand, Pin- 828122, India.
E-mail:shinjanjournal2014@gmail.com

CONTENT

		Page No.
1. Impact of Industrialsation on Well-Being of the People in India : A Benefit or Detriment *Prasenjit Ghosh*		1-11
2. Dialecties of Masculine Culture and Feminine Culture in Mahesh Dattani's Bravely Fought the Queen *Tamali Neogi*	:	12-24
3. Two Decades' Economic Political Crisis of Post Independence: Subject Matter West Bengal and Utpal Dutta's Drama *Aloke Biswas*	:	25-31
4. Equity and Inclusion in Higher Education: NEP 2020 *Trishna Goswami (Kundu) & Mali Paul*	:	32-44
5. India's foreign policy towards Pakistan since 2014 onwards: A perspective on security *Avick Dhar*	:	45-55
6. Bengal Engineering College: Journey from the Beginning *Baisali Guha*	:	56-66
7. The Lepchas of Sikkim and Darjeeling in the Eastern Himalayas: A Review *Kalikrishna Sutradhar*	:	67-80
8. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ট্র্যাজেডি ভাবনা: নূরজাহান ও সাজাহান *ধ্রুবজ্যোতি পাল*	:	81-89
9. গিরীন্দ্রনন্দিনীর 'ঘোলপুর': ইতিহাস ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন *অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়*	:	90-108
10. স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ : ধর্ম দর্শন বেদ-উপনিষদ ও গীতার আলোকে একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ *অজয় কুমার দাস*	:	109-125

11. রবীন্দ্রনাথের মানব ধর্মে শ্রেয় ও প্রেয় : 126-135
নাসিরুদ্দিন মণ্ডল
12. শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'
উপন্যাস: একটি পাঠ-প্রতিক্রিয়া : 136-154
আশুতোষ বিশ্বাস
13. প্রসঙ্গ - বাংলা দলিত সাহিত্য : 155-163
নেপাল বিশ্বাস
14. বিষ্ণুপুরী দশাবতার তাসঃ এক প্রাচীন ঐতিহ্য : 164-172
চৈতালী মান্ডি
15. সুনীল বসুর কবিতা : একটি শৈলীগত নিরীক্ষণ : 173-179
বিজন বিশ্বাস
16. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ধ্বনির
বিন্যাস: শৈলীগত পর্যবেক্ষণ : 180-200
দিব্যজ্যোতি কর্মকার
17. কিশোরগঞ্জের কৃষক আন্দোলন ও বাংলাদেশে
কমিউনিস্ট পার্টির বিকাশ: একটি পর্যালোচনা : 201-209
ভবানন্দ রায়
18. ভারত ও চীনের সম্পর্কের সাম্প্রতিক প্রবণতা : 210-217
দিনেশ দাস ও অনিন্দ দত্ত
19. ঔপনিবেশিক পর্বে মেদিনীপুর জেলায় নারীর
সামাজিক জীবন: প্রসঙ্গ উপজাতি সম্প্রদায় : 218-228
বিশ্বজিৎ মল্লিক
20. বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে
'ইয়ং কমেরডস্ লীগ' এর অবদান : 229-238
সুশেন্দু বিশ্বাস
21. আব্দুল জববারের 'মাতালের হাট':
আদিবাসী জীবনকথা : 239-248
সমীরণ কোড়া
22. পুণ্ড্র সমাজের ইতিকথা : 249-257
শ্যামাপ্রসাদ মণ্ডল

23. নিভৃত স্বতন্ত্রতা থেকে নিবিড় অন্তরঙ্গতা:
রবীন্দ্রমানসে লোকায়ত চেতনা : 258-270
উৎপল সেন ও অনুরূপা মুখোপাধ্যায়

24. সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা'য়
লোকজীবনের প্রতিফলন : 271-279
সঞ্জিৎ সরকার

25. ন'দের শান্তিপুর ও নিমাই : 280-286
সিদ্ধার্থ ঘোষ

26. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট
আন্দোলনের মাত্রা : 287-302
অমিত রায়

27. একই সমস্যার ভিন্ন রূপঃ মঙ্গলকাব্যে ও একালের
নির্বাচিত কিছু উপন্যাসে : 303-316
বৈশাখী ব্যানার্জী

28. কামিনী সুন্দরী দেবীর 'উর্ব্বশী নাটক':
একটি শিল্পগত অনুসন্ধান : 317-325
দেবরাজ হাওলাদার

29. আফসার আমেদের ছোটগল্পে মুসলমান সমাজ : 326-336
রাববীনূর আলী

30. মধ্যবিত্তের জীবন ভাবনা ও নৈঃসঙ্গবোধ: প্রসঙ্গ
'জনক ও কালো কফি' এবং 'কয়েকটি মানুষের
সোনালি যৌবন' : 337-347
ফারজানা রুমা

31. শৈলীবিজ্ঞান ও সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চায় অধ্যাপক
সুকুমার সেন : 348-356
বাপী সরকার

32. পরিবেশ দূষণ - সমাজ চেতনায় 'শ্রাবণ হাওয়া'
ও 'ভালো রাক্ষসের গল্প' : 357-362
সুরজিৎ মণ্ডল

- Authors' Details : 363-365

 ISSN : 2454-33

ঔপনিবেশিক পর্বে মেদিনীপুর জেলায় নারীর সামাজিক জীবন: প্রসঙ্গ উপজাতি সম্প্রদায়

বিশ্বজিৎ মল্লিক

সংক্ষিপ্তসার

জেলার পশ্চিম প্রান্তে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষগুলোকে বেশি দেখা যায়। পূর্বের সমতল ভূমির মানুষগুলোর জীবনযাত্রার সঙ্গে উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার পার্থক্য রয়েছে। স্থানীয় জমিদার, রাজন্যবর্গ, ব্রিটিশ সরকারের শোষণ, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি থেকে এরা ছিল বঞ্চিত। বনজ সম্পদের ওপর নির্ভর করে ও অল্পসল্প কৃষিকাজ করে এদের জীবন নির্বাহ হত। উপজাতি মহলে মানুষগুলোর আচার, ব্যবহার ধর্মিয় রীতি-নীতি সবক্ষেত্রেই ছিল বৈচিত্র্যের ছাপ। শহরাঞ্চলে নারী শিক্ষার কমবেশি প্রচলন থাকলেও উপজাতি সম্প্রদায়ের নারী ছিল বঞ্চিত। অভাবের তাড়নায় পুরুষের সঙ্গে সফল ভাবে কর্মে লিপ্ত হতে হয়েছে তাদের। সময়ের সাথে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও খুব বেশি প্রভাব পড়েনি এদের সামাজিক জীবনে। বর্তমানে সচেতনতা, শিক্ষা ও সরকারী উদ্যোগ উপজাতি নারীর জীবনে কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। তারই পরিণতি স্বরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ খুঁজে পেয়ে চলেছে।

মূল প্রবন্ধ:

অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীকে বাদ দিয়ে এ সম্পূর্ণ সমাজ কখনোই কল্পনা করা যায় না। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের নারীর কমবেশি ছিল, তবে ব্যাপক অর্থে নয়। আধুনিক যুগে পদার্পণ ও নবজাগরণের প্রেক্ষা নানা কুসংস্কারকে প্রতিহত করে দেশের সর্বত্রই কমবেশি নারীর উন্নয়নে বিশিষ্ট অবদান স্মরণীয়। নারী উন্নয়নের জোয়ার মেদিনীপুর জেলার মধ্যে পড়লেও তার জেলার পশ্চিম প্রান্তে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়ের নারীর উন্নয়নের ধারাকে প্রভাবিত করেছিল সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেলার একদিকে পার্বত্যময় কঙ্করপূর্ণ ভূভাগ গড়বেতা, শালবনী, গোদাপিয়াশাল, ঝাড়গ্রাম, লালগড়, গোপিবল্লভপুর, নয়াগ্রাম প্রভৃতি অরণ্যঘেরা লাল মাটির দেশ। আবার দক্ষিণ পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগ তীরে শস্য ঘেরা মাঠ ও নদ-নদীর সমাবেশ। কিন্তু এই শস্য শ্যামলা অঞ্চলের

পশ্চিম দিকের অজলা অফলা শিলাময় প্রান্তরে বসবাসকারী আদিম উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবন ছিল দুর্বিসহ। জেলার পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের অরণ্য শঙ্কুল অঞ্চলগুলিতে ভার, ভূমিজ, গন্ড, খেড়িয়া, খারোয়ার, কোল, নাট, পুরান, সবর, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম পাহাড়ি উপজাতির বাস।[১] এরা ছিল স্বাধীনচেতা ও শান্তপ্রকৃতির, সমতল ভূমির মানুষজনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। উপজাতি মানুষগুলোর জীবিকা, রীতিনীতি, ধর্মীয় জীবন, ঘরবাড়ি পোশাক-আশাকের মধ্যে ছিল বৈচিত্রের ছাপ।

অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে দেখা যায় তার প্রমাণ আমরা ঋকবেদে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, বিভিন্ন পুরাণ, কথাসরিৎ সাগরে, রামায়ণে, মহাভারতে, বানভট্টের কাদম্বরী ও হর্ষচরিতে নিদর্শন পেয়ে থাকি। অরণ্যাবৃত অঞ্চলে এক থেকে দেড়লক্ষ বছর আগে আদিম মানুষেরা প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর এবং তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিল। ১৯৭৮ সালে ঝাড়গ্রাম মহকুমার লালগড় থানায় কংসাবতী ও তরাফেনি নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে সিজুয়া নামকস্থানে মাটির নীচে একটি মনুষ্য চোয়ালের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এই জীবাশ্মটিকে 'হোমো-সেপিয়েনস্' বলে উল্লেখ করেছে ভারতবর্ষের-ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ।[২] জেলার পশ্চিম প্রান্তে বিভিন্ন জায়গায় প্রত্নবস্তুর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে সিংভূম, মানভূম, সাঁতভূম (শিলদা), মল্লভূম (ঝাড়গ্রাম) এবং রামগড়, লালগড়, শালবনী প্রভৃতি অঞ্চল ছিল আদিম উপজাতির বাসভূমি। আর এই জঙ্গলাকীর্ণ প্রতিকূল পরিবেশেই আদি মানবদের হাতে সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল।[৩]

জেলার পশ্চিম প্রান্তে গভীর অরণ্য ও লাল ল্যাটেরাইট শিলা দ্বারা গঠিত কংকরময় ভূভাগ দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। অনুর্বর মৃত্তিকাতে প্রাণের সঞ্চার করেছে সুবর্ণরেখা, দামোদর, কাঁসাই দ্বারকেশ্বর, ডুলং, শিলাই প্রভৃতি নদ-নদীর জলের ধারা। গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত কংকরময় মৃত্তিকাকে অবলম্বন করেই উপজাতি মানুষগুলো, পশুপালন ও কৃষির মাধ্যমে জীবন যাপন করত। নদী নালার তীরে তীরে নিরলস ভাবে চলে লাল মাটির বুক চিরে সবুজ ফসল ফলানোর কাজ।[৪] কৃষিকর্ম পশুপালন, মৃৎশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, ধাতুশিল্প ও বনজ সম্পদ সংগ্রহকে কেন্দ্র করেই উপজাতি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সমাজ জীবন। ১৯৯১ এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় মেদিনীপুরে মোট জনসংখ্যা ৮৩৩১৯১২ জন, আর উপজাতির সংখ্যা ৬৮৯৬৩৬ জন।[৫] M.C. Mcalpin এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় মেদিনীপুরে মোট সাঁওতাল জনসংখ্যা ছিল ১৪৮২৫১ জন, আর ভূমিজ জনসংখ্যা ছিল ৪৪২৩৩ জন।[৬] কুড়মি জনসংখ্যা ছিল ৫৭৯০৯ জন, ভুঁইয়া জনসংখ্যা ছিল ৮৬২৯ জন, মুন্ডা জনসংখ্যা ছিল ৫০১ জন[৭]। আর ১৯৫১ এর সেন্সর রিপোর্ট অনুযায়ী জেলায় লোধা জনসংখ্যা ছিল ৬০৪০ জন।[৮]

ISSN : 2454-3322

ঊনবিংশ শতকে নবজাগরণের প্রেক্ষিতেই নারীমুক্তির প্রয়াস শুরু হয়েছিল সর্বত্রই। মেদিনীপুর জেলাও তার থেকে বাদ পড়ে নি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা দিক্ষায় নারীকে উন্নত করতে সচেতনতা ও আন্দোলন শুরু হয়েছিল। জেলার শহরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের মানুষ জনের মধ্যে সামাজিক আন্দোলন ও শিক্ষার প্রসার হলেও অরণ্য শঙ্কুল অঞ্চলে উপজাতি মহলের মধ্যে সামাজিক আন্দোলন ও শিক্ষার প্রসার ঘটানো ছিল আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। কেননা তাদের দৈনন্দীন জীবন-যাপন করার জন্য স্ত্রী-পুরুষ দু'জনকেই জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হত। তাদের জীবন ছিল আহরণ, পশুপালন ও কৃষিকাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরা শান্ত প্রকৃতির স্বাধীনচেতা মানুষ। নিজেদের রীতিনীতিতেই থাকতে ভালবাসে তারা। তাই উপজাতি মহলের নারী সমাজের মধ্যে সামাজিক উন্নতি ও শিক্ষার প্রসার ঘটানো সহজ ব্যাপার ছিল না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু পাঠশালা থাকলেও আধুনিক শিক্ষার প্রয়াস শুরু হয়েছিল মিশনারীদের পদক্ষেপে।

জেলার উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মীয় উৎসব, জীবিকা বেশিরভাগ একই রকম। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত। যে পরিবারে পুরুষ নাবালক সেখানে নারীই কর্ত্রী হিসাবে পরিগণিত হয়। বিবাহের পর পুরুষের গোত্র নারী গ্রহণ করেন। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার হলেও নারীর প্রাধান্য যথেষ্ট দেখা যায়। উপার্জনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান ভাবে উপার্জন করে থাকেন। পরিবার প্রতিপালনের জন্য দৈনন্দিন গৃহের প্রয়োজনীয় দায়দায়িত্ব পালনে মহিলাই মূল ভূমিকা পালন করে থাকে, তাই মহিলা ছাড়া পরিবার অচল।[৯]

অভাব ও দারিদ্রতার জন্য স্বামী স্ত্রী দু'জনকেই কাজে যেতে হয় ছোট ছেলে মেয়েদের বাড়িতে রেখে। ছয় থেকে বার বছর বয়সের বালিকারা দিনের বেলায় সব কাজ করে থাকে। কিন্তু এই বয়সের বালিকাদের সংসারের দায়দায়িত্ব ছাড়া লেখাপড়া করা অসম্ভব ছিল। বালিকারা স্কুলে গেলে গৃহের কাজ করার জন রোজগেরে সদস্যদের বাড়িতে বসে যেতে হবে সংসারের প্রয়োজনে। উপজাতি মহলে নিত্য অভাব অনটনের মধ্যে দিনপাত হয়। অল্প আয় দিয়ে মেয়েদের লেখাপড়া না শিখিয়ে ছেলেদেরকেই লেখাপড়া শেখাত। তাদের ভাবনা ছিল বিয়ের পর মেয়েরা পরের বাড়িতে চলে যাবে। তাই তাদের জন্য পয়সা খরচ করে লাভ নেই। আর্থিক দুরাবস্থাই তাদেরকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে।[১০]

উল্লেখ্য বার থেকে পনের বছরের মেয়েরা বাবা মার সাথে কাজে যোগ দেয়— রাস্তা তৈরি, পুকুর কাটা, মাটি কাটার কাজে, বীজতলা রোপন, ধান কাটা-তোলার কাজে

অংশ নিয়ে মা বাবার রোজগার বাড়ায়। তাই অর্থনৈতিক দিক থেকে পনেরো বছরের পর মেয়েদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে কাজে বের হওয়ার পূর্বে গৃহের প্রাতঃকালীন কাজগুলি সেরে যান, যেমন উঠোন এবং ঘরের মেঝে গোবরজল দিয়ে লাতা দেওয়া, রান্নার বাসনপত্র পরিস্কার করা, মুরগী, ছাগল ও গরুর ঘর পরিষ্কার করা, রান্না করে স্বামী ও বাচ্চাদের খাইয়ে নিজে খেয়ে কাজে বের হয়। বাইরের কাজে মহিলারা পুরুষের থেকে কোন অংশে কাজ কম করেন না। কাজ শেষে মজুরি পাবার পর মহিলারা সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে বাড়ি ফেরে।[১১]

ব্রিটিশ ভারতে অরণ্য শঙ্কুল অঞ্চলগুলি অশান্তির আগুনে পুড়েছে। জঙ্গলমহলের অঞ্চলগুলি বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম এর প্রকৃত সম্পত্তি তখন বর্ধমান রাজার অধিনে ছিল।[১২] আবার ঝাড়গ্রামের গ্রামগুলি দাঁড়িয়ে ছিল বনজ সম্পদের ওপর নির্ভর করে।[১৩] প্রজাদের নিত্য তাড়া করেছে উৎপীড়নের উদ্বিগ্নতা। তাছাড়া রাজাদের ছিল স্থায়ীত্বের অনিশ্চয়তা। অরণ্যে বন্য জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে বনজসম্পদ সংগ্রহ করতে হত। রোদে পুড়ে জলে ভিজে জমিতে কঠোর পরিশ্রম করেও ফসলের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয় আকাশের দিকে। বৃষ্টি না হলে বিগত দিনের সমস্ত বকেয়া সুদে মুলে উসুল করে নিয়ে যেত রাজার কর্মচারীরা।[১৪]

উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজনের অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা জিনিসপত্রই বেঁচে থাকার উৎস। সারাবছর কাজের সুযোগ সুবিধাও তেমন থাকে না, তাই পুরুষ ও মহিলাকে আহরণ করার পথই বেছে নিতে হয়। তারা জঙ্গল থেকে লাউ, তসর, সিল্ক, মোম, রঙ, ছাল কাপড়, রজন, শুকনো কাঠ, চারকোল, ময়ূর পালক, নীলকণ্ঠ পাখির পালক, হরিণ এবং মহিষের সিং সংগ্রহ করত। জঙ্গলের পণ্য সংগ্রহ ও ব্যবসার মাধ্যমে সাঁওতাল, ভূমিজ মাঝি, কুড়মী ও লোধা সম্প্রদায়ের মানুষ জীবিকা নির্বাহ করত।[১৫] এছাড়াও তারা শালপাতা, কেন্দুপাতা, ধুনা, ছাতু, শালবীজ, কচড়া বীজ, কুরকুট ও তার ডিম, বন্য কন্দমূল যথা - চুরকি আলু, পান আলু, চুন আলু, বাঙলা আলু প্রভৃতি দ্রব্য স্থানীয় প্রতিবেশীদের এবং বাজারে বা কোন কোন দ্রব্য নির্দিষ্ট ব্যবসায়ীকে বিক্রি করে থাকে।[১৬] ২-৩ টি করে কাঁচা শালপাতা দিয়ে ছোট ছোট থালা বানিয়ে তারা স্থানীয় বাজারের খাবার দোকানে বিক্রি করে। কেন্দুপাতা খটখটে শুকনো করে ১-২ কেজি করে বান্ডিল বেঁধে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বিক্রি করে। আবার শুকনো কাঠকে ছোট ছোট বান্ডিল করে ১০ টাকা আঁটি হিসাবে বিক্রি করে বাড়িতে বাড়িতে।

খাল, বিল, নালা, রেলপথের ও পাকা সড়কের পাশের জলা জমিগুলিতে মাছ ধরে। মাছ ধরার কাজটিতে প্রধানত রমনীরাই বেশির ভাগ অংশগ্রহণ করে থাকে। মেয়েরা

হাত দ্বারা বেশিরভাগ মাছ ধরে। অনেক পরিবারে লোকসংখ্যা কম থাকায় এরা গবাদীপশু পালন করতে পারে না। কারণ কাজের জন্য সবাইকে চলে যেতে হয়। আবার উপার্জনের টাকা ভাগ নিয়ে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা শুরু হয়। কেননা, মেয়েদেরকে উপার্জনের একটি ভাগ নেশা করার জন্য স্বামীকে দিতে হত। বাকি টাকা দিয়ে মেয়েরা সংসার চালায়। জীবিকার অনিশ্চয়তার জন্য তারা বহুদূর দূরান্তে সমতল ভূমিতে স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে কাজ করতে যেত। কিছু দিন কাজ করার পর তারা স্থায়ী বাসস্থানে ফিরে আসত। আবার সমতল ভূমিতে কাজের সুযোগ সুবিধা বেশি থাকায় তারা কেন পুকুর পাড়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস ও করত।[১৭]

ঝাড়গ্রাম সাঁকরাইলে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়ের মেয়েরা বাবুই চাষ, জারা চাষ, নয়াগ্রাম, ব্লকের উপজাতির মেয়েরা তসর গুটি চাষের সাথেও যুক্ত থাকে। যে সমস্ত পরিবারগুলিতে অল্পস্বল্প জমি আছে তাদের অন্যত্র কাজের জন্য যেতে হয় না বলে তারা বিভিন্ন পশুপাখী পালন করে থাকে। মেয়েরা শাল পাতার বাটি, বাবুই দড়ি পাকানো, বিড়ি তৈরি, খেজুর পাতার চাটাই তৈরি করে উপার্জন করে। পশুপালন করে চারু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রামে বিক্রি করে। বহু গ্রামে গুড় দিয়ে মহুলের মদ তৈরি করে বিক্রি করে।[১৮] সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মেয়েরা মদ ও হাঁড়িয়া বিক্রি করে।

উপজাতি মহলের মেয়েরা কৃষিকাজ, জুনঘাস কাটা, ঝুড়ি বানানো, মাদুর তৈরি, জ্বালানি কাঠ বিক্রয়, শুকনো পাতা বিক্রি করত। হান্টার সাহেব তার রিপোর্টে মহিলাদের কাজের ভিত্তিতে যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন সেখানে দেখা যায়, Female cuitivators-13,229, Female grass cutters -73, firewood sellers 522, sellers of leaves -96, sellers of straw and grass-14, female labourers-6809.[১৯]

ষাট বছর ও তারও বেশি বয়সের বৃদ্ধাদের অবস্থা খুবই দুঃখের। এঁরা খাদ্যাভাবে ও বয়সের ভারে খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। উপজাতি মহলে বেশিরভাগ ছেলেদের বিয়ে হয়ে গেলে সে আর মা-বাবার কাছে থাকে না। তাই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার শারীরিক পরিশ্রম করার ক্ষমতা কমে গেলে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা থাকে না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পুত্র ও পুত্র বধূদের থেকে আলাদা থাকলেও এক বা একাধিক নাতি-নাতনী এঁদের সঙ্গে থাকে।[২০]

উপজাতি মানুষগুলির ঘরবাড়ি পোশাক আশাকে আধুনিকতার ছাপ না থাকলেও এক অনন্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাড়িগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খড়ের চাল যুক্ত চারচালা বিশিষ্ট খুবই সুন্দর। ঘরবাড়িগুলি তৈরি করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই পরিবেশ থেকে সংগৃহিত হয়। মেয়েরা বাড়ির দেওয়ালে ও দরজার সামনে নানা রকমের নকশা তৈরি করে। প্রকৃতি নির্ভর এই গোষ্ঠীগুলির গ্রাম রচনা করার

আগে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে সন্তুষ্ট করার রীতি রয়েছে। তাই সাঁওতাল গ্রামে দেখা যায় জাহেরস্থান, মাঝিস্থান, মুন্ডাদের গ্রামে সারণা, লোধাদের গ্রামে বড়ামস্থান।[২১] মেয়েদের পোশাক আশাক সাদামাটা, শাড়ি ব্লাউজ ব্যবহার করেন এবং বৃদ্ধা বয়সে সাদা কাপড় ব্যবহার করেন। পূজা পার্বণে মেয়েরা মাথাতে নানা রকমের পাখির পালক ব্যবহার করে নৃত্য ও গান করে। উপজাতি সম্প্রদায়ের সাঁওতাল, ভূমিজ, মুন্ডা প্রভৃতি জাতিগণ সাঁওতালী, ভূমিজ, মুন্ডারী, কোরা প্রভৃতি খাড়ওয়াড়ী ভাষা ব্যবহার করেন।[২২]

এদেরও পরিণত বয়সে ছেলে মেয়ের বিবাহ হয়ে থাকে। ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকে। দুটি পরিবারের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ঘটকের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এদের বিবাহ রীতিতে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল কন্যা পক্ষকে পণ দিতে হয়। আদিবাসী সমাজে ঘটকের মাধ্যমে বিয়ে হয়ে থাকলে তাকে 'সাদা বাপলা' ও ছেলে মেয়ে ভালোবেসে বিবাহ করলে সেই রীতিকে বলে 'অরইতুৎ'। আবার কোন মেয়ে পাত্রকে পছন্দ করলে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এই রীতিকে 'ঞির' বলে। ওরাঁও ও খেড়িয়াদের বিবাহ পদ্ধতি একই রকম। মুন্ডা বা হো সমাজেও ঘটকের মাধ্যমে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে থাকে। কন্যা পক্ষকে বিয়ের জন্য নগদ টাকা দিতে হয়, লোধা সমাজের বিয়েতেও কন্যাকে পণ দিতে হয়। উপজাতি সমাজের বিয়েতে নানা তুকতাক, পূর্বপুরুষের আত্মাকে এবং গ্রাম দেবতাদের সন্তুষ্ট করার বিধান রয়েছে।[২৩]

ভূমিজ মহলে বহুবিবাহকে স্বীকৃতি দেয়। বিধবা-বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়, আবার কোন বিধবা স্ত্রীর পক্ষে তার প্রয়াত স্বামীর ছোট ভাইকে বিয়ে করা ঠিক বলে বিবেচিত হয়।[২৪] মানভূমের ভূমিজদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে যদি কোন মহিলা ব্যাভিচারিণী বলে প্রমাণিত হয়। তারপর একটি শাল পাতাতে জল ঢালা হয় এবং স্বামী পৃথকীকরণের প্রতীক হিসাবে ভেজা পাতার মধ্যে দু'ফোঁটা অশ্রু দেয়। 'pat pain chira' and 'the wet leaf rent' অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ কে নিখুঁত করার পাশাপাশি স্ত্রী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে কোনও দাবি থেকে স্বামীকে মুক্তি দেয়।[২৫]

উৎসব ও পরব পার্বণ প্রধানত কৃষি জীবন ও অরণ্য জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, গাজন ও মরক পরব এদের কাছে জাতীয় উৎসব বলা যেতে পারে। টুসু বন্দনা, সংকঠি-নাচ, পরিখেল, লোকযাত্রা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে উপজাতি মহল। সারা পৌষ মাস ধরে বাগাল, ভূমিজ, মাঝি, বাউরী, কুমার, মাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মেয়েরা প্রতি সন্ধ্যায় টুসুর বন্দনা করে।[২৬] ভাদুপূজা সম্পূর্ণ রূপে মেয়েদের উৎসব, সন্ধ্যার পর ভাদুর সামনে মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে বসে সারা রাত ধরে গান করে।[২৭]

 ISSN : 2454-3322

জেলার শহরাঞ্চলগুলিতে শিক্ষার চল থাকলেও অরণ্য শঙ্কুল অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ জনের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তেমন কোন দেশীয় উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। ঐ সমস্ত পাশ্চাৎপদ অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসেন মিশনারীগণ। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে মিশনারীদের উদ্দ্যোগে সদর থেকে ৩২ কিমি দূরে ভীমপুর অঞ্চলে একটি গির্জা প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৮] মিশনারীগণ মেদিনীপুরে অনাথ মেয়েদের জন্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, তখন বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৭৮ জন। মিশনারীদের উদ্যোগে ঐ সমস্ত অঞ্চলে ৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি মেদিনীপুর শহরে একটি নর্ম্যাল স্কুল পরিচালিত হয়। ১৮৮১ সালে স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হয় ১৬০০;যার মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ২৫০ জন। রেভারেন্ড আর ব্যাচেলরের উদ্যোগে ১৮৬২ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় বেশ কিছু প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৬৭ সালে মিশনের ৩৩টি প্রাথমিক স্কুলে প্রায় ৪৫০ জন সাঁওতাল ছাত্র পড়াশোনা করত। ১৮৬৯ সালে মিশনের স্ক্রেফসরুড সাহেব জো গাড়িয়ায় মেয়েদের জন্য প্রাথমিক স্কুল ও ছাত্রী আবাস তৈরি করেন।[২৯]

ম্যাকাল পিনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, মেদিনীপুরে সাঁওতালদের ওপর শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্য খুব কমই ছিল। মিশনারীদের নেতৃত্বে ৪৫টি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিবাসীরা লেখাপড়া শিখত।[৩০] মিশনারী শিক্ষা পদ্ধতির প্রভাব বিনপুর, গড়বেতা, শালবনী এবং ঝাড়গ্রামে খুব ভাল ছিল। কৃষ্ণনগর ও চামার বাঁধে (গোপিবল্লভপুর) বিদ্যালয়গুলি শিক্ষক মহাশয়ের পারিশ্রমিক না দেওয়ার ফলে বন্ধ হয়ে যায়।[৩১] কিন্তু রোহিণীতে তুলনামূলক ভাল ব্যবস্থা ছিল সেখানে বেশ সংখ্যক শিক্ষিত খ্রিষ্টান সাঁওতালও ছিল। সুবর্ণরেখার দক্ষিণে বেশিরভাগ অঞ্চলের শিক্ষা চিত্রটা খুব ভাল ছিল না। অস্তিতে একটা পাঠশাল ছিল ঐ পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন ভূমিজ, তার ত্রিশ জন ছাত্রছাত্রী ছিল;যার মধ্যে ১০ জন ভূমিজ এবং ২০ জন সাঁওতাল।[৩২]

অরণ্য শঙ্কুল অঞ্চলগুলিতে প্রাথমিক পর্বে শিক্ষার পরিবেশ না থাকলেও মিশনারীরা এখানে শিক্ষার সূচনা করেছিল এবং সেই সাথে ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির সহযোগিতাও কম ছিল না। ঝাড়গ্রামে মল্ল রাজবংশের সপ্তদশ রাজা ছিলেন নরসিংহ মল্লদেব। তিনি প্রায় উনিশ লক্ষ টাকা এবং দশ হাজার বিঘা জমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দান করে গেছেন। কুমুদকুমারী ইন্সটিটিউশন রাজ কলেজ, রাণী বিনোদমঞ্জুরী রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বাণী ভবন, রামকৃষ্ণ সারদা পীঠ বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁরই কীর্তি।[৩৩] ১৯১২ সালে ঝাড়গ্রাম রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সাঁকরাইল থানার কুকড়াখুপিতে একটি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল বলে শোনা যায়।[৩৪] ১৯৩৯ খ্রী: লেডি অবলা

বোস ঝাড়গ্রামের রাজা নরসিংহ মল্লদেব এর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করেন 'বিদ্যাসাগর বাণী ভবন'। এখানে বিধবা মেয়েদের শিক্ষার সাথে সাথে তাদের হাতের কাজও শেখানো হয়।[৩৫]

প্রত্যেকটি উপজাতির নিজেদের সমাজ শাসন পদ্ধতি রয়েছে। সাঁওতালদের গ্রামের প্রধানকে মাঝি বলা হয়। মাঝির সহকারীর নাম 'পারাণিক'। ডাকহাঁকের জন্য রয়েছে 'গোড়াইৎ'। মাঝির উর্দ্ধতন মালিক হল 'পরগনাইৎ'। ওরাঁ ওদের গ্রাম প্রধানের উপাধি হল 'মাহাতো'। ভূমিজ বা লোধা এবং খেড়িয়াদের পূজা করার পুরোহিতের নাম দেহেরী বা 'দেউড়ী'।[৩৬] গ্রাম পঞ্চায়েত মতে বিবাহ ও পারিবারিক বিবাদের মিমাংসা হয়। গ্রাম্য সংগঠনে মহিলাদের কোন ভূমিকা না থাকায় পুরুষরা যে কোন একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে সম্পদ নষ্ট করে। নারীকে পুরুষরা আয়ত্বে রাখার স্বার্থে প্রাচীনকাল থেকে নানা অনুশাসন তৈরি করে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছেন। তাঁদের দবিয়ে রাখার জন্য নানা রকম অযৌক্তিক গল্প কিংবদন্তী উপকথা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। নারীর বিরুদ্ধে যত অযৌক্তিক অপবাদ ছড়ানো থাকুক না কেন, উপজাতি মহলে মেয়েদের কর্তিত্বেই পরিবারের আর্থিক বুনিয়াদ টিকে আছে।[৩৭] এদের সমাজে দারিদ্রতা, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে পরিবারগুলিতে মেয়েদের ওপর অনেক অত্যাচার চলে স্বামীর দ্বারা, কখনো নেশা করার টাকা নিয়ে বা কখনো নেশা করে এসে বাড়িতে অশান্তির সৃষ্টি করে।

অনেক সময় সরলতা ও দারিদ্রতার কারণে উপজাতি মেয়েদের অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। মহাজন, ঠিকাদাররা সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের বিভিন্ন ভাবে ঠকিয়ে থাকে। কাজের সূত্রে দূর দূরান্তে যেতে হয় তাদের, সেই সূত্রে বহু আদিবাসী মহিলা ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। ঝাড়গ্রাম মহকুমা থেকে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে বীরভূম, দুমকা থেকে বর্ধমান, কালনা, কাটোয়াতে বহু আদিবাসী রমণী প্রতি বৎসর যৌন বলাৎকারের শিকার হন।[৩৮] স্মরণাতীত কাল থেকেই এই শান্তি প্রিয় মানুষগুলোর উপর অন্যায় অত্যাচার হয়েছে। জমিদার, মহাজন, নবাবী আমলা, পাঠান, ব্রিটিশ রাজের অকথ্য অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলেই এরা বিদ্রোহ করত। ১৭৮৪ সালে তিলকা মাঝির বিদ্রোহ, ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৩২ সালে কোল বিদ্রোহ, এমনকি ২০০৮ এ আরও একবার ঘোষিত হয় জঙ্গল মহলে আদিবাসী বিদ্রোহ 'লালগড় অভ্যুত্থান'।[৩৯] বিদ্রোহগুলোর ওপর যে ভাবে নির্মম অত্যাচার করা হত তার প্রমাণ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহে ব্রিটিশ শক্তির নির্মমতার পরিচয় পাওয়া যায় 'সংবাদ প্রভাকরে'—

"দুরাচারীরা স্ত্রীলোকদিগের আভরণ ও পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত লইয়া গিয়াছে, জননীর ক্রোড় হইতে শিশু সন্তানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মুখেই বিনষ্ট করিয়াছে।"[৪০]

 ISSN : 2454-3322

পরিশেষে বলা যায় সমতল ভূমির মানুষজনের মধ্যে যে সামাজিক পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় সেই পরিবেশ পশ্চিম প্রান্তে বসবাসকারী উপজাতি মহলে লক্ষ্য করা যায় না। ঔপনিবেশিক পর্বে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। শান্তি প্রিয় স্বাধীনচেতা মানুষগুলো তখনই গর্জে ওঠেছে যখন অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। দৈনন্দিন অভাব অনটনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে সামাজিক মান উন্নয়ন ঘটানো সহজ কাজ ছিল না। উপজাতি মহলে নারীকে আলাদা করে দেখা খুব মুশকিল। কেননা স্বামী-স্ত্রী দু'জনের সমান নেতৃত্বেই দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা দীক্ষার পরিবর্তন ঐ সমস্ত অঞ্চলে সহজে আসে নি। পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এদের ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না। কাজের জন্য মহিলাদের কেউ সমান তালে পুরুষদের সাথে সঙ্গ দিতে হত। সামাজিক ভাবে মহিলাদিগকে উন্নয়ন করার জন্য চাই সরকারী হস্তক্ষেপ, প্রগতিশীল মানুষজনের দ্বারা সচেতনতা বাড়ানো ও শিক্ষার প্রসার। সংবিধানের ৩৪২ নং অনুচ্ছেদে কিছু গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে সুযোগ দেবার বিধান রয়েছে। বর্তমানে মেদিনীপুরে 'লোধা সেল' করে ঝাড়গ্রামে অফিস করা হয়েছে, বেলপাহাড়িতে উপজাতি কল্যাণ বিভাগের পরিচালনায় একটি সরকারী বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রীদের আবাসগৃহ গড়ে তোলা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৯ সালে সরকারী আদেশ নামার মাধ্যমে 'Joint Forest Management' প্রথম প্রয়োগ করা হয়। এরপর অরণ্য বিভাগের উদ্যোগে ১৯৯১ সালে প্রথম 'Forest Protection Committees' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯১ সালের নির্দেশ জারি করে মেয়েদের সদস্য পদ দেওয়া হয়েছে। গোটা রাজ্যে ১১টি নারী পরিচালিত FPC রয়েছে, যার মধ্যে ৩টি হল আদিবাসী নারী পরিচালিত।[৪১] পূর্বের বহু বাধা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উপজাতি মহলের বহু মেয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-দীক্ষায় বর্তমানে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে চলেছে।

তথ্যসূত্র:

১. Hunter W.W., A Statistical Account of Bengal, Vol. III, Part-I, Calcutta, 1876, Page: 37
২. 'This also forms the record of erliest human fossil in India' (NEWS pub. by G.S.I. 3rd Issue, 9th Part. 1978, Page: 7)
৩. দে ড: মধুপ, ঝাড়গ্রাম এক আরণ্যক জনপদ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ: ১৪।
৪. দে ড: মধুপ, জঙ্গল মহলের লোককথা, মেদিনীপুর, ২০০২, পৃ: ৪-৫।
৫. রায় প্রণব, মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, কলকাতা, ২০০২, পৃ: ৩২১।

৬. Mcalpin M.C., Condition of the Sonthals Birbhum, Bankura, Midnapore and North Balasore, Calcutta, 1981, Page: 4.
Ibid, Page: 67.
৭. প্রহ্লাদকুমার ভক্তা, শোধাশবর জাতির সমাজজীবন, কলকাতা, ২০০৯, পৃ: ১৬।
৮. স্বাক্ষাৎকার, স্বপন মুর্মু, বেলপাহাড়ী, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্তমান জেলা ঝাড়গ্রাম, ২০-১২-২০১৯।
৯. ভক্তা প্রহ্লাদকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৯।
১০. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮০।
১১. Chakraborty Ranjan, Dictionary of Historical Places Bengal 1757-1947, New Delhi, 2013, Page: 300-301.
১২. O'malley L.S.S., Bengal District Gazetteers Midnapore, Calcutta, 1995, Page. 65.
১৩. দে, ড: মধুপ, ঝাড়গ্রাম ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ: ১৯০।
১৪. Hunter W.W., op.cit., Page-25.
১৫. প্রহ্লাদকুমার ভক্তা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯০।
১৬. রায় প্রণব, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ৩২৬।
১৭. ভক্তা, প্রহ্লাদকুমার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১০২, ১০৩।
১৮. Hunter W.W., op. cit., Page-33-34.
১৯. ভক্তা প্রহ্লাদকুমার, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ৮০।
২০. রায়, প্রণব, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ৩২৭।
২১. বসু যোগেশচন্দ্র, মেদিনীপুরের ইতিহাস, কলকাতা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা: ৪২৩।
২২. রায়, প্রণব, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৩০।
২৩. Risley H.H., The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I, Calcutta, 1892, Page: 123.
২৪. Ibid., P. 123
২৫. দে ড: মধুপ, জঙ্গল মহলের লোককথা, মেদিনীপুর, ২০০২, পৃষ্ঠা: ১১।
২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৪।
২৭. রেভারেন্ড তুষার টুডু, আর্লি হিস্ট্রি অফ আমেরিকান ব্যাপাটিস্ট চার্চ, ভীমপুর, ড: আলোক মান্ডি (সম্পা.), আমেরিকান ব্যাপটিস্ট চার্চ ভীমপুর;সুভেনিয়র, ২০০২।
২৮. বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ, সাঁওতাল ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড, সুবর্ণরেখা, ২০১০, পৃষ্ঠা: ১০২, ১০৩।
২৯. Mcalpin, M.C., op.ciot., Page-57.
৩০. Mcalpin, M.C., op.ciot., Page-57.
৩১. Mcalpin, M.C., op.ciot., Page-57.
৩২. দাস মন্মথনাথ, মেদিনীপুর চরিতাভিধান, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা: ৯৪।
৩৩. দে ড: মধুপ, ঝাড়গ্রাম ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৯১।
৩৪. সেন দিবাকর, লেডি অবলা বসু, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪১১, পৃষ্ঠা: ১৯।

৩৬. রায় প্রণব, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৩৩।
৩৭. ভক্তা প্রহ্লাদকুমার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ৮১।
৩৮. ভট্টাচার্য অমিতাভ, বাঁকুড়ার ধান কাটতে এসে ২ আদিবাসী তরুণী ধর্ষিতা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯-১১-২০০০।
৩৯. দে দেবশ্রী, পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত ১৯৪৭-২০১০, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা: ১২৫।
৪০. সংবাদ প্রভাকর - সংখ্যা - ৫৩০০, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা: ১২৪।
৪১. দে দেবশ্রী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১২।

CALL FOR PAPERS

Deadline for submission (Full paper) - 31 January for February Issue & 31 July for August Issue in every year.

Strictly follow the guideline

E-mail: shinjanjournal2014@gmail.com

Website: www.shinjan.in

Copyright © : Council of SHINJAN

All articles protected by copyright and any article can not be used in any manner without the permission of the Council of Shinjan. Council of Shinjan may re-use the articles published in the Shinjan for its various other publication.